Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.24-31
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

"নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র"

ড. শিপ্রা দত্ত

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা, ভারত

Abstract:

Narendranath Mitra (1917-1975), a prolificstoryteller of the forties. Family problems and psychological tension of Bengali middle class, lower middleclass life are the main themes of his literature. There is no such romantic story instead there is practicality in his story. There are very familiar stories of known people. He wrote about four hundred stories. I will try to present in my essay some selected stories of psychoanalysis of men and women.
Narendranath Mitra pursued reality through various stories in solitude and silence. The actres`s story presents a perfect picture of middleclass life in Kolkata during that time. 'the happiness of the family is due to the quality of the women'-the truth of this much discussed saying is found where women empowerment has to be maintained in all aspects through acting. So, Lavanya has to act constantly in her family.

The story 'Mahasweta' does not contain much narrative; it is a realistic picture of the unfolding of the psychological analysis of tasteful, beautiful women named Mahasweta (Amita). The significance of the female character is the taste of motherhood. This type of perfect psychological analysis can be seen in the story of 'Dampatya'. In the story of 'Abataranika' we see the story of indomitable struggle to survive in a middleclass family in the complex socio-economic context of the forties. In the story 'Ekpo dudh'- a well-known picture of the lowermiddleclass life has been presented to us through a brand new psychological analysis.

The period when the storyteller appeared in the arena of Bengali literature was the era of decadence of human values. Apart from this, World War II, Manyantar, communal riots, country partition etc; made people`s minds broken. Contemporary writters expressed the various aspects of the period in a slightly distorted way with intense thrust. But Narendranath Mitra, instead of going in that direction, has presented the contemporary film in a slightly different way with a softhearted sweetness. People want to save themselves through suffering and struggle. So, there is no harshness in his story, no excess of slant. With the magic touch of simple and uncomplicated writting, his story penetrates into the jewels of human hearts and explores an unenlightened world. This is his uniqueness.

Keyword: Psychological, Narrative, Communual, Contemporary, Harshness.

ছোট গল্প কথাসাহিত্যের সমস্ত শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সজীব এবং তীব্র গতিশীল সর্বাধুনিক শিল্পরূপ। স্বল্প পরিসরে মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড কাহিনির মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে ছোট গল্পের। কিন্তু তার মধ্যেই যেন ধরা পড়ে জীবনের সামগ্রিক আবেদন, প্রকাশ পায় মানব জীবনের গভীর ব্যঞ্জনা। তাই আশা-আকাঙ্ক্ষার, দুঃখ বেদনার, আলো আঁধারি খেলায়, শিল্পরূপের অভিনবত্বে, বাস্তব জীবন চেতনার স্পর্শে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ছোটগল্প নিঃসন্দেহে ঊনবিংশ শতাব্দীর A peculiar product of lonely voice.

বাংলা ছোটগল্পের শৈশব পর্ব রবীন্দ্রনাথের স্পর্শেই যৌবনে পদাপর্ণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ‘কল্লোল’ পত্রিকাকে অবলম্বন করে বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছিল নতুন পালক। প্রবাহিত হয়েছিল যুগ পরিবর্তনের হাওয়া। এই সময়ের লেখকদের লেখায় ফুটে উঠেছিল মানসিক যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের সুর। এর হাত ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই বাস্তবতার নব অঙ্গীকার নিয়ে ছোট গল্পের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন সেই সময়ের বিখ্যাত গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)। গ্রাম জীবনের ভাঙন, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি সমকালীন বাস্তব জীবনের ছবিকে নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করার বাসনা নিয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেন। মানুষের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে অন্তরলোক আবিষ্কার করাই ছিল তাঁর লেখনীর মূল প্রেরণা। তাঁর রচিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের আলোচনা এখানে উপস্থাপন করছি।

‘চড়াই উৎরাই’ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র কল্যাণের এক উচ্চবিত্ত বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণ অন্যদিকে রয়েছে দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া পূর্ব প্রণয়িনীর দারিদ্র্য ক্লিষ্ট সংসারের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই দুই প্রান্তের মাঝখানে শেষপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি কল্যাণের নিরাসক্ত নির্লিপ্ত জীবন দর্শন। কল্যাণ পেশায় সামান্য বেতন ভোগী কেরাণী। লেখক কৌশলে এই গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের তিন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুবসুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। একদিকে রয়েছে তাঁর সহপাঠী অসিত যে ছিল ব্যারিস্টার পরেশ মজুমদারের ছেলে। আর একদিকে একাধারে পূর্ব প্রণয়িনী এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়া মল্লিকা নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি, উচ্চবিত্ত বাহ্যিক আড়ম্বর সর্বস্বতা, মেকী মহানুভবতা, আর নিম্নবিত্তের নির্লজ্জ কুৎসিত অর্থ লিপ্সা ও বিকৃত রুচি এই দুই শ্রেণির চাপে পড়ে কল্যাণ সমাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে নিয়েছিল।

পেশায় সামান্য রোজগারের কেরাণী কল্যাণ তাঁর সাহিত্যসেবী রোমান্টিক মানসিকতা দিয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানে আবদ্ধ সেখান থেকে একবার তাঁর উচ্চতর শ্রেণীর দিকে উত্থান এবং একবার নিম্নতর স্তরে অবতরণের অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই চড়াই উৎরাই। সমাজের উভয় শ্রেণীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না কল্যাণ। মধ্যবিত্তের আত্মসম্মান বোধ এতটাই প্রখর যে উপড়েও উঠতে পারে না, আবার নিজের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নীচেও নামতে পারে না। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হয় নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিরাপদ আশ্রয়ে।

তাঁর রচিত ‘রস’ গল্পের বিষয় বিন্যাসের নানা আভাসে ইঙ্গিতে মিশে আছে এক সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। এই গল্পে গল্পকার যেন নীরবে নিভৃতে বসে রোমান্টিক সৌন্দর্য প্রিয় মেজাজ নিয়ে চিরকালের মানব-মানবীর চিরন্তন হৃদয় রহস্যের গভীরতম তাৎপর্য সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ‘রস’ গল্পে দেখি মোতালেফের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলে সুন্দরী ফুলবানুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু টাকার অভাবে তাকে বিয়ে

করতে পারে না। সংসারের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে রাজেক মিঞার বিধবা বউ মাজু খাতুনকে বিয়ে করে। রস দিয়ে গুড় তৈরি করতে সে ছিল খুবই ওস্তাদ। তার রূপ ছিল না কিন্তু গুণ ছিল। গুড় বিক্রি করে বাজারে সে অনেক প্রশংসা পায়। শীত চলে যায় আসে বসন্ত। মোতালেফ গুড় বিক্রি করে যে টাকা রোজগার করেছিল তা দিয়ে ফুলবানুকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে আর মাজুকে দেয় তালাক। ফুলবানুকে নিয়ে মোতালেফ কাটিয়ে দেয় কয়েক মাস। আবার শীত আসে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। রূপসী ফুলবানু মোতালেফের মন রাঙালেও গুড় তৈরিতে কোনো সুনাম অর্জন করতে পারেনি। ব্যবসায়ী মহলে তার খ্যাতি নষ্ট হয়। শুরু হয় রূপমোহের সঙ্গে জীবিকার লড়াই।

সুন্দরী ফুলবানু মোতালেফের মনকে তৃপ্তি দিতে পারবে কিন্তু পেটের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিনে সে হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয়। রাগে দুঃখে-হতাশায় মোতালেফ ফুলবানুর গায়ে হাত তুলে বলে, "হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই, তুমি আছ সাজ গোছ লইয়া।"[১] রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও তার মন ভরে না, খালি খালি মনে হয় দুনিয়া। আশাভঙ্গের দিনে মনে পড়ে যায় দক্ষ পরিশ্রমী জীবন সঙ্গিনী মাজু খাতুনকে। কিন্তু মাজু খাতুনের বিয়ে হয়ে যায় নাদির শেখের সঙ্গে। গল্পকার খুব কৌশলে ফুলবানু ও মোতালেফের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চিড় ধরার চিত্র তুলে ধরেছেনগল্পের শেষে রসের হাঁড়ি নিয়ে মোতালেফ যায় নাদির শেখের বাড়ি। প্রেমানুভবে করে মাজুখাতুনের কাছে আত্মসমর্পণ। মাজুখাতুন তাকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। তবুও ভালবাসা বলে জীবনে প্রেম নামক একটি শব্দ আছে তাই মোতালেফ ও মাজু খাতুনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গল্পের শেষ লাইনটি হয়ে উঠেছে অসাধারণ। লেখকের ভাষায়, – "গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাখাড়ির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছে, চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।"[২] পাঠকের বুঝতে বাকি রইল না যে মোতালেফের জীবনে রোমান্টিক প্রেম ছিল ক্ষণিকের কারণ দেহের সৌন্দর্য দুই দিনের আর গুণের আদর চিরকালীন। আভাসে ইঙ্গিতে চরিত্রগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই চিরন্তন সত্য কথাটি প্রকাশিত হয়ে উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পারিবারিক জীবনে যে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার জ্বলন্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'এক পো দুধ' গল্পে। এক পো দুধ কে কেন্দ্র করে সংসারে বাকবিতণ্ডা, ঝগড়া আবার তাকে কেন্দ্র করে সংসারে শান্তি পুনরায় ফিরে আসা সব মিলিয়ে সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক বাস্তব ছবি এই গল্পের মূল বিষয়। চারজনের সংসার। প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রয়োজনে দুধ খাওয়া দরকার। তাই স্বামী বিনোদ যখন পুরো দুধ খেয়ে নেয় তখন স্ত্রী লতিকা রাগে জ্বলে উঠে। বলে, – "তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলে পুড়ে মরি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করে না রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে?"[৩] বিনোদ চটে গিয়ে এঁটো হাতেই স্ত্রীর দিকে তেড়ে আসে। বলে, – "লজ্জা করবে কেন রে হারামজাদি, আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই? নিজের পয়সায় খাই, লজ্জা তোদের করা উচিত।"[৪] এখানে লতিকা ও বিনোদ বলে কথা নয় প্রায় প্রত্যেক ঘরের নিত্যদিনকার ঘটনা। আবার পরক্ষণেই বিনোদ তার স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। লেখকের ভাষায় বলা যায়, – "অনেক সাধ্য সাধনায় স্ত্রীকে ক্ষান্ত করল বিনোদ। শেষ রাত্রে দেখা গেল কোলের মেয়েকে বাঁদিকে সরিয়ে রেখে লতিকা বিনোদের কোলের কাছে এসে ঘুমিয়েছে।"[৫] এই এক পো দুধের জন্যই একসময় স্বামী হয়ে গিয়েছিল তুই, বুড়োবেটা। স্বামীর কাছে যে স্ত্রী ছিল ভালবাসার

সঙ্গী সেই স্ত্রী হয়ে গেল হারামজাদী। সবশেষে এই এক পো দুধ সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আগুন নিভিয়ে দিয়ে সংসারে চির শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। তখন এক পো দুধ ঝগড়ার বিষয় নয় তা হয়ে গেল সবার কাছে ভালবাসার প্রতীক। এটাই হল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনীর বৈশিষ্ট্য। গল্প পড়তে পড়তে ছবির মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পরিবেশ পরিস্থিতি। তাতে কোন বাহাদুরি নেই, নেই কোন বর্ণনার ঘনঘটা। শুধু রয়েছে সাদা মাটা ভাষায় প্রতিদিনকার ঘরের কাহিনী। এই ভাবে মানব সম্পর্কের একদিকে ভাটা আবার পর মুহূর্তেই জোড়া লাগার নিঁখুত ছবির মধ্যে পাই মানব মনের গভীরে অবস্থিত এক অনালোকিত হৃদয়েরসন্ধান।

দুয়ে মানব রহস্য উন্মোচনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সৃষ্টি সুদূর প্রসারিত। তিনি মানব মনের দক্ষ আবিষ্কারক। মানবমনের গভীরে যে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘুরপাক খায় তার এক নিপূণ ছবি দেখতে পাই ‘সেতার’ গল্পে। থাইসিস রোগে আক্রান্ত স্বামী সুবিমল হাসপাতালে শয্যাশায়ী। তাই তার জীবন সঙ্গিনী নিলীমা মন প্রাণ দিয়ে স্বামীকে সুস্থ করার সঙ্কল্প নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ির অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান শেখাতে বাইরে বেরিয়েছে, সেতারে হাত দিয়েছে। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে স্বামী যেদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে সেদিনই ছিল বৃহত্তম আসরে সেতার বাজানোর কথা। স্বামীর ঐকান্তিক কামনা বাসনার কাছে তাকে হার মানতে হয়। খোলা আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার আনন্দ থেকে তাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। কর্তব্য পালন না খ্যাতি তার কাছে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রেম ও প্রয়োজনের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় হয়। আর প্রয়োজনের তাগিদ হয়ে যায় তুচ্ছ। বাইরের ডাক উপেক্ষা করে স্বামীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘরের মধ্যেই তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। খাঁচা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পাখি আবার খাঁচায় ফিরে আসে। গল্পের শেষে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দের মধ্য দিয়ে অনুরণিত হয় এক হৃদয় বেদনা। লেখক ঘটান বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন। যা গল্পটিকে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দেয়। জীবন রহস্যের চকিত দীপ্তি তাঁর গল্পকে করে তোলে বেশ উপভোগ্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বিখ্যাত গল্প ‘পালঙ্ক’। দেশ ভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল এই গল্পের পটভূমি হলেও সব কিছুকে ছাড়িয়ে মানব মনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই হয়ে উঠে এই গল্পের মূল বিষয়। গল্পের শুরু হয় এইভাবে - “হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই।”[৬] প্রকৃতপক্ষে তাই। সব থেকেও যে তাঁর কেউ নেই। সংসারে সবাই চলে গেছে, সবাই ভুলে গেছে রাজমোহনকে। শূন্য সংসারে তিনি একটা নিতান্তই নিঃসঙ্গ। যে রাজমোহন জীবনে কিছুই বিক্রি করেন নি, তিনি বাধ্য হয়েই বিক্রি করেন পুত্রবধূর বিয়ের পালঙ্ক। ফলে পুত্রবধূর ঘরের পালঙ্কখানার শূন্যস্থানকে কোনমতেই ভরাট করতে পারলেন না। মকবুল পালঙ্ক কিনে তাকে হাত ছাড়া করতে চায় না কিছুতেই। যে মানুষ বিত্তহীন, কোনদিন আভিজাত্যের স্বাদ পায়নি সেই মানুষটি এই পালঙ্কের জোরে সমস্ত কিছুকে হাতের মুঠোয় বলে ভাবতে থাকে। পালঙ্কে ঘুমিয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন হয়তো দেখতে পারবে কিন্তু বাস্তবের পৃথিবী যে খুবই কঠিন তা মকবুল অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করতে পারল। শেষপর্যন্ত পালঙ্ক রাজমোহনকে আবার দিয়ে দিল। এইভাবে দুটি মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে যে আশা নিরাশার, মান অভিমানের খেলা চলছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাকে খুব দরদ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত সব কিছুকে ছাড়িয়ে মানব মনের অসাধারণ বিশ্লেষণই এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু হয়ে ধরা পড়েছে পাঠকের হৃদয় মন্দিরে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতির এক ফসল 'বিকল্প'। মাসিক দেড়শ টাকা বেতনের কেরাণী হরগোবিন্দ। এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়েই তার সংসার। স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছে। মেয়ে সুধাকে পাত্রস্থ করার জন্য বাবা খুবই চিন্তিত। সুধা বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে – "তোমার পছন্দই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।"[৭] হঠাৎ তাদের বাড়িতে আগমন ঘটে ছেলের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর। নাম তার ইন্দ্রভূষণ। তাকে সুপুরুষ বলা যায় না কিছুতে, এছাড়া সে ছিল শূদ্র। সুধা ধীরে ধীরে তার প্রেমে পড়ে যায়। হরগোবিন্দ তাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কঠোর শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে। কিন্তু ভালোবাসার কাছে সবই বৃথা। তাই গল্পের শেষে হরগোবিন্দকেই বলতে শুনি, "একজন প্রাইভেট টিউটর, ছেলের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর।"[৮] সুধার আচার আচরণ হরগোবিন্দকে নানা ভাবে পীড়া দিতে থাকে। মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তিনি বিকল্প ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিকল্প আর একজন প্রাইভেট টিউটার কি আর সুধার ভালোবাসার মানুষ হতে পারবে? ইন্দুভূষণের মতো সুধার হৃদয়কে আকৃষ্ট করতে পারবে? শেষ পর্যন্ত বাবার বিকল্প চিন্তাকে সুধা নীরবে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, – "ও সব কথা থাক্ বাবা"[৯] বাবা মেয়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই গল্পের নামকরণ ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক আর একটি গল্প হল 'দাম্পত্য'। এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু নিম্নমধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য। সাত কন্যা সন্তানের জননী রমা স্বামীর প্রতি নানা কারণে বীতশ্রদ্ধ। স্বামী হঠাৎ মারা যায়। একদিকে বৈধব্য যন্ত্রণা, আর একদিকে সন্তানদের মানুষ না করতে পারার কষ্ট সব মিলিয়ে স্বামী মারা যাওয়ার পরও রমার রোষানল থেকে মুক্তি পায়নি। সময়ে অসময়ে স্বামীকে নানা বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকে। গল্প কথক নির্মল ঠাকুরপো কে অনেক সময় রমা তার মনের কথা জানায়। এর মধ্যে রমা আবিষ্কার করে সে অন্তঃসত্ত্বা। নির্মলকে চিঠিতে জানায়, – "আমি আবার আমি আবার সে আমার আবারও সর্বনাশ করে গেছে নিমু ঠাকুরপো।"[১০] এখানে তিনবার 'আবার' কথাটি লক্ষ্যণীয়। অষ্টম সন্তানটিকে নষ্ট করার জন্য সে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি। যথাসময়ে বীরেনের অষ্টম সন্তান ভূমিষ্ট হল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অষ্টম সন্তানকে দেখবার জন্য নির্মল রমার কাছে গেলে রমা ব্যথিত হৃদয়ে জানায়, – "মেয়েকে বলল তোমাকে? ছেলে! তার অনেক দিনের সাধ ছিল এ জিনিস দেখবে, দেখে যেতে পারল না। কেন অমন করে চলে গেল ঠাকুরপো।"[১১]

রমার এই কথা শুনে নির্মল বাবু তো বটেই পাঠকও অপ্রস্তুত হয়ে যায়। পাঠক একাগ্র চিত্তে ভাবতে থাকে রমার অন্তরের গভীর বেদনার কথা। এই তো জীবন। এটাই তো স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক। যে স্ত্রী কন্যাদের দায় ভার গ্রহণ করা নিয়ে সর্বক্ষণ চিন্তিত ছিল সে পুত্রের দায় ভার গ্রহণ করা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হল না বরং স্বামী পুত্রের মুখ দেখে যেতে পারল না বলে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। যে নারীকে আমরামুখরা ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন, প্রেমহীন বলে ভেবেছি। সেই নারীর মধ্যে হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম তার লুকিয়ে থাকা স্বামী সোহাগিনী পত্নীর হৃদয়কে। পুত্র সন্তান লাভ করে মধ্যবিত্তের ভেঙে পড়া ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্য জীবন যেন স্বর্ণালী আলোয় ঝলমল করে উঠে। এই গল্পটিতে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ব্যঞ্জনা চোখে পড়ে খুব সহজেই। মানব মনের বিশ্লেষণই যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মূল লক্ষ্য তা স্পষ্ট হয়ে উঠে গল্পের শেষে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এক জটিল মনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ 'মহাশ্বেতা' গল্পটি। মানব মনের কারখানায় যে প্রতিনিয়ত মনের ভাঙ্গা গড়ার কাছ চলছে আর এই জগৎ উদ্ঘাটনে গল্পকার একজন দক্ষ শিল্পী। এই গল্পের নায়িকা অমিতা। তার স্বামী অকালে মৃত্যুবরণ করার পর সে শুভ্রবেশধারী নিরলঙ্কৃতা বিধবার মতই দিন কাটাতে থাকে। তার পূর্ব প্রেমিক চিন্মোহন যে এরই মধ্যে খুঁজে পায় তার মনের মানুষটিকে। এই সাজেই তার ভাল লাগে। ফলে তার নতুন নামকরণ করে মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা আর চিন্মোহন নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শাশুরি, ভাসুর, ননদ সবার তীক্ষ্ণ কঠোর কথা অমিতা সহ্য করতে না পারলেও অগত্যা মেনে নেয়। কিন্তু গল্পের শেষে আমরা সচকিত না হয়ে পারি না যখন সবার কথায় মহাশ্বেতা নব বধূর সাজে সজ্জিত হয়ে চিন্মোহনের শোবার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে তখন চিন্মোহন হতচকিত হয়ে তাকে আঘাত করার মতোই যেন ব্যঙ্গোক্তি করে বলে উঠে – "তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে? একেবারে চতুর্দশী বালিকা বধূ!"[১২] এই একটি মাত্র সংলাপে গল্পকার চিন্মোহনের জটিল মনের জগৎকে আবিষ্কার করেছে খুবই সহজে। অন্যদিকে চিন্মোহনের কথায় আহত অমিতার মন আবিষ্কৃত হয় এইভাবে, – "স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা, এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমিতে রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।"[১৩] কারণ যে ছিল তার একমাত্র অবলম্বন তার কাছে নিশ্চয় সে এইরকম আঘাত পাবে আশা করতে পারে নি। আর একদিকে চিন্মোহন অমিতার নিরাভরণ, শ্বেত শুভ্রতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিল মনের তৃপ্তি। অমিতার নব বধূরূপে সজ্জিত হওয়ার দৃশ্য সে মেনে নিতে পারে নি। অমিতার এই বেশ ছিল তার কাছে এক অপরিচিত দাবি। তাই অমিতা ও চিন্মোহনের মানসিক টানাপোড়েন, অমিতার বিষাদময় পরিণতি পাঠকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। মানব মনের গভীরে প্রবেশ করে তার অন্তরের গোপন জায়গাটুকু চিনিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন এক অসাধারণ লেখনীর যাদুস্পর্শে। এখানেই গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্যন্যতা।

বাস্তব জীবনের সঙ্গে অভিনয় জগতের অনেক ব্যবধান এই সত্যটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন 'অভিনেত্রী গল্পে। লাবণ্য তার স্বামী বিনয় আর একটি রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে তাদের ছোট্ট সংসার। সংসার চালানোর মতো তেমন কোন রোজগার ছিল না বলে ঝগড়া ছিল তাদের সংসারের প্রতিদিনকার রোজনামচা। বিনয়ের বন্ধু অনিমেষ চৌধুরী ছবির পরিচালক। লাবণ্য ছবিতে অভিনয় করবে অনিমেষের এই অনুরোধে বিনয় খুব কষ্টে রাজি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় লাবণ্য প্রতিনিয়ত অভাব অনটনের সংসারে যে অভিনয় করে যাচ্ছে। মঞ্চে তাকে কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারেনি বরং পেশাদার অভিনেত্রী মালতী মল্লিক সেই অভিনয় নিখুঁতভাবে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিল সবাইকে। গল্পের শেষে দেখি বাড়িওয়ালা ভাড়া চাইতে এলে লাবণ্য স্বামীর দাস্তবমির কাল্পনিক অসুখের কথাকে এমন ভাবে অভিনয় করে দেখাল যা দেখে বাড়িওয়ালা কথা না বাড়িয়ে চলে যেতে বাধ্য হল। অনিমেষ এসব দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে – "আপনি মালতী মল্লিকের চেয়ে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো?"[১৪] লাবণ্য স্থির দৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে অদ্ভূত হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল, – "মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো এতখানি তার সাধ্যেও কুলোত না।"[১৫] এর পরেও দেখা গেল লাবণ্যের ঠোটে হাসিটুকু লেগে রয়েছে কিন্তু চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। বিচিত্র ভাবের এমন সূক্ষ্ম প্রকাশ মুহূর্তের মধ্যে গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে তাদের গোপন রহস্যটুকু নরেন্দ্রনাথ মিত্র যেমন সাবলীল ও প্রাণস্পর্শী করে প্রকাশ করেন বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে তা সত্যিই ব্যতিক্রম। তিনি শুধু সমস্যার

যন্ত্রণাটুকু দেখিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন না, সমস্যার ঘোর কাটিয়ে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অনালোকিত রাস্তাটুকু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সমসাময়িক লেখকরা সেই সময়ের বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করেছিলেন। তীব্র খোঁচার মাধ্যমে একটু বিকৃত ভাবে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সাহিত্যে সমকালকেই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নগ্ন, কুৎসিত ভাবে নয়, শান্ত সুমধুর ভাবে। তাঁর গল্পে প্রখর সমাজ বাস্তবতার ছবি নেই, তিনি অবলম্বন করেছেন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মানুষকে। তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সমস্যা সমাধান, হাসি-কান্না, প্রেম-অপ্রেম ইত্যাদির মাধ্যমে নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ছিল তাঁর লেখনীর মূল কথা। তিনি রিক্ততার মধ্যে দেখেছেন পূর্ণতাকে, কুৎসিতের মধ্যে দেখেছেন সৌন্দর্য সুধাকে। কারণ তাঁর গল্পে ব্যক্তি মানুষ ও মনন প্রধান স্থান অর্জন করলেও জীবনের অন্ধকার দিক গুলিকে তিনি সযত্নে পরিহার করে ছিলেন। তীক্ষ্ণ বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে চান নি বলেই তাঁর ভাষায় কোনো কঠোরতা নেই, ব্যঙ্গপ্রবণতা নেই, রয়েছে। মানব মনের নিভৃত গহনে জমে থাকা বিশ্লেষণী শক্তি। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা।

তথ্যসূত্র:

1) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-৭৫।
2) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-৭৭।
3) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৬৮।

4) তদেব।
5) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৬৯।
6) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪৭।
7) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৬১।
8) নরেন্দ্রনাথ মিত্র-গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-৩৭৪।
9) নরেন্দ্রনাথ মিত্র- গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩৭৩।
10) নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪২।
11) নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৪৪।
12) নরেন্দ্রনাথ মিত্র- গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২৩।
13) তদেব।
14) নরেন্দ্রনাথ মিত্র গল্পমালা-১, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা-২১৩।
15) তদেব।